OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 471 - 480
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 471 - 480
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

‘বিদ্যাসাগরচরিত’ - এর দর্পণে বিদ্যাসাগর : এক অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থ

ড. মৌসুমী পাল
সহযোগী অধ্যাপিকা
স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা
Email ID : mousumipal1971@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
আত্মজীবনী, সংস্কৃতপাঠ, ইংরেজীশিক্ষা, চতুষ্পাঠী, অধ্যয়ন, সংস্কৃত কলেজ, জীবনীগ্রন্থ, সংস্কৃতশাস্ত্র, মালস্টোন।

Abstract
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ‘বিদ্যাসাগরচরিত’ গ্রন্থটি তাঁর তিরোধানের অনেক আগেই রচনা করেছিলেন। তবু তিনি এই গ্রন্থটির রচনা সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। তিনি এর দু’টি পরিচ্ছেদ মাত্র রচনা করেছিলেন। এই দু’টি পরিচ্ছেদের প্রথমটিতে তাঁর পূর্বপুরুষের বিবরণ এবং দ্বিতীয়টিতে তাঁর নিজের শৈশবকালের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

শারীরিক অসুস্থতা ও নানা ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য বিদ্যাসাগরের অনেক গ্রন্থ অসমাপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। ‘বিদ্যাসাগরচরিত’ও এর ব্যতিক্রম নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনী রচনার পরেও দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। সেই কালের কথা তাঁর নিজের জীবনীতে লিপিবদ্ধ হয়নি। তাঁর আত্মজীবনীতে জীবনের দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত। পরবর্তীকালে তিনি সমাজের জন্য অনেক কাজ করে গেছেন। নারীশিক্ষা আন্দোলন এবং বিধবাবিবাহ আন্দোলনের তিনি পথিকৃৎ। কিন্তু তাঁর নিজের লেখা জীবনীতে এগুলি অনুপস্থিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়শই তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নিজের জীবনের অনেক ঘটনার গল্প করতেন। এছাড়াও তিনি অনেক কাগজপত্র রেখে গেছেন। সেগুলিকে অবলম্বন করে তাঁর জীবনচরিত লেখা কিছু অসম্ভব ছিল না। কিন্তু জীবনচরিত নিজে লেখা আর অন্যের লেখার মধ্যে যে অনেকটা পার্থক্য তা আমরা সকলেই জানি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রী নারায়ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তাঁর পিতা জীবনচরিত সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি বলে আক্ষেপ করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে ১৮৯১ সালে তাঁর পুত্র শ্রী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিতার রচিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী ‘বিদ্যাসাগরচরিত’ নাম দিয়ে সংকলন করেছিলেন।

আমরাও মনে করি যে পরবর্তী সময়ে বিদ্যাসাগরের জীবনী গ্রন্থ যতই রচিত বা প্রকাশিত হোক না কেন, তার নিজের লেখনীতে নিজের জীবনী গ্রন্থ রচনার একটা স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে। কারণ অন্যের রচিত গ্রন্থ জীবনী গ্রন্থই হবে, আত্মজীবনী নয়। আর জীবনীগ্রন্থ ও আত্মজীবনী গ্রন্থের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য তো রয়েছেই। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর জীবনে আমাদের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 471 - 480
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা সাহিত্যকে, আমাদের সমাজকে অনেক কিছুই দিয়ে গেছেন। তাঁর এই ঋণ পরিশোধ করার মতো নয়। কিন্তু যে আত্মজীবনী রচনায় তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন, সেই কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি বলে আমাদের চিরদিনের জন্যই আক্ষেপ রয়ে গেল।

'বিদ্যাসাগরচরিত' এর প্রথম পরিচ্ছেদের শুরু হয়েছে বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মগ্রহণের ঘটনা দিয়ে। এই পরিচ্ছেদে প্রথমে পিতৃপক্ষের পূর্বপুরুষদের পরিচয় দেওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্র মাতৃপক্ষের পূর্বপুরুষদেরও পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঁচ বছর বয়সের সময়কাল থেকে 'বিদ্যাসাগরচরিত' এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরু। এই দুটি পরিচ্ছেদে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর ঠাকুরদা রামজয় তর্কভূষণ ও তাঁর বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং নিজের জীবনের অনেক কথাই লিপিবদ্ধ করেছেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মধুসূদন বাচস্পতির পরামর্শে ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করানো পর্যন্ত এসে আত্মজীবনী রচনায় বিদ্যাসাগরের লেখনী অবসর নিয়েছে। এই দুটি পরিচ্ছেদের এক অসমাপ্ত জীবনচরিতকে অবলম্বন করেই আমি আমার এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি।

Discussion

আত্মজীবনী হচ্ছে লেখকের স্বরচিত জীবনচরিত বা আত্মকথা। আত্মজীবনী বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যেও একটা বিশেষ স্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা ভাষায় অনেক আত্মজীবনী রচিত হয়েছে। যদিও সবগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। ঊনিশ শতকের আগে বাংলা ভাষায় কোন আত্মজীবনী লেখা হয়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের গীতিকবিতায় ভণিতার মাধ্যমে আত্মপরিচয় তুলে ধরার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে কাহিনী কাব্যে আত্মপরিচয় অনেকটা বিস্তারিত আকারে লেখা হয়েছে। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও পদ্মাবতী কাব্যে আলাওল এরূপ আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তবে আধুনিক ধারায় আত্মজীবনী বলতে যা বোঝায় এগুলি তার মধ্যে পড়ে না।

সাহিত্য হিসেবে আত্মজীবনীর যথার্থ আত্মপ্রকাশ ঘটে ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে। এরূপ প্রথম আত্মজীবনী রচনা করেন দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধিকারচেতনা জাগ্রত হলে আত্মচরিত রচনার কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। কারণ নিজের জীবনকথা বর্ণনা করার প্রয়াস ব্যক্তিত্বদের একটা অভিপ্রায় মাত্র। তবে সকল আত্মজীবনী এক মাপের ও এক চরিত্রের নয়। কেউ কেউ আত্মজীবনী রচনার ক্ষেত্রে বাল্যস্মৃতির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ গুরুত্ব দিয়েছেন কর্মজীবনের উপর। কিছু আত্মজীবনী আছে যেগুলিতে রচয়িতারা সমকালীন আর্থসামাজিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

আত্মজীবনী রচনা করতে গিয়ে বাল্যস্মৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এমন কতগুলি জীবনী গ্রন্থ হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছেলেবেলা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাল্যস্মৃতি', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা', গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বাল্যজীবন', মন্মথ মজুমদারের 'আদর্শ ছাত্রজীবন' প্রভৃতি।

আত্মজীবনীর মাধ্যমে কেউ কেউ প্রধানত কর্তব্যকর্মের সফলতা, বিফলতা বা তার পরিবেশ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এসবের অধিকাংশই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি। রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই ধরনের আত্মচরিতগুলি বিশেষ ভূমিকা রাখে। এসব স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনী শুধু এককভাবে লেখকদেরই তুলে ধরেনি, ব্যক্তিগত তত্ত্ব ও তথ্যের আড়ালে জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখ এবং সংগ্রাম ছাড়াও তার অগ্রগতির ধারাও এগুলিতে লুকিয়ে রয়েছে। সাহিত্যের গবেষণা তো বটেই সমাজবিজ্ঞানীদের জ্ঞানপিপাসাও এগুলি অনেকখানি পূর্ণ করতে সক্ষম। সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে আত্মজীবনীগুলির মূল্য যাই হোক, একটি জাতির ইতিহাসে এগুলি মূল্যবান সম্পদরূপে পরিগণিত।

বাংলা লেখ্য গদ্য বিকাশের ধারায় রামমোহন রায়ের পরবর্তী পরিণতির দিশারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রবীন্দ্রনাথের মতে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী। তিনিই বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথম কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। আসলে তিনি সাহিত্যসৃষ্টির জন্য গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হননি। অনেকের মতে, পাঠ্যপুস্তক রচনাই তাঁর মূল

উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর নিজস্ব শৈল্পিক সত্তায় সাহিত্যের আবেদন গড়ে উঠেছে। তাঁর রচনায় তিনি সমাজসংস্কারকে সামনে রেখেই বিতর্কের লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁর বিতর্কের ভাষায় যুক্তি এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব ছিল না। কিন্তু স্বভাবে তিনি ছিলেন যথার্থ শিল্পী। তিনি ছিলেন দয়ার সাগর। তাই তাঁর বিতর্কমূলক লেখায় কখনো আবেগ, কখনো কখনো কটাক্ষ ও বিদ্রূপ দেখা গেছে। তাতে ভাষার চরিত্রে এসেছে বৈচিত্র্য। এখানেই বিদ্যাসাগরের শিল্পী চরিত্রের উৎস।

বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক যেমন রচনা করেছেন, তেমনি রচনা করেছেন পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত স্বাধীন রচনা, কিছু অনুবাদমূলক রচনা এবং কিছু মৌলিক রচনাও। তিনি ছোটদের জন্য যেমন সাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি রচনা করেছেন বড়দের উপযোগী সাহিত্যও। তাঁর রচনাগুলি হল– 'বাংলার ইতিহাস' (১৮৪৮), 'জীবনচরিত' (১৮৪৯), 'বোধোদয়' (১৮৫১), 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), 'কথামালা' (১৮৫৬), 'সীতার বনবাস' (১৮৬০), 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯)। পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ে বিচার বিতর্কমূলক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭১-৭৩), 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫১), বিদ্রূপাত্মক বেনামী রচনার মধ্যে আছে 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (সম্ভবত ১৮৬৩) ও স্বরচিত জীবনী 'বিদ্যাসাগর চরিত'(১৮৯১, মরণোত্তর প্রকাশিত)।

বাংলা সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'বিদ্যাসাগর চরিত'। এই গ্রন্থটি বিদ্যাসাগর মহাশয় তার তিরোধানের অনেক আগেই রচনা করেছিলেন। তবু তিনি এই গ্রন্থটির রচনা সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। তিনি এর দু'টি পরিচ্ছেদ মাত্রা রচনা করেছিলেন। এই দু'টি পরিচ্ছেদের প্রথমটিতে তাঁর পূর্বপুরুষের বিবরণ এবং দ্বিতীয়টিতে তাঁর নিজের শৈশবকালের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র শ্রী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯১ সালে তাঁর পিতার রচিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'বিদ্যাসাগরচরিত' নাম দিয়ে সংকলন করেছিলেন। পাবলিশার্স ছিলেন ক্যালকাটা লাইব্রেরী। এই সংকলিত গ্রন্থটিতে তিনি 'বিজ্ঞাপন' নামাঙ্কিত ভূমিকা অংশে লিখেছেন –

> "পিতৃদেব পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বীয় 'আত্মজীবনচরিত' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সম্পূর্ণ করা দূরে থাকুক, দুই পরিচ্ছেদের অধিক তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। শারীরিক অসুস্থতা ও নানাকার্য্যে ব্যস্ততা নিবন্ধন তাঁহার অনেক আরব্ধ গ্রন্থ অসমাপ্ত পড়িয়া আছে। তাঁহার আত্মজীবনচরিতও তাহাদের অন্যতম।"[১]

এটাও ঠিক যে, শারীরিক অসুস্থতা ও নানা ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য বিদ্যাসাগরের অনেক গ্রন্থ অসমাপ্ত অবস্থায় রয়ে গেছে। 'বিদ্যাসাগর চরিত'ও এর ব্যতিক্রম নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনী রচনার পরেও দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। সেই কালের কথা তাঁর নিজের জীবনীতে লিপিবদ্ধ হয়নি। তাঁর আত্মজীবনীতে জীবনের দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত। পরবর্তীকালে তিনি সমাজের জন্য অনেক কাজ করে গেছেন। নারীশিক্ষা আন্দোলন এবং বিধবাবিবাহ আন্দোলনের তিনি পথিকৃৎ। কিন্তু তাঁর নিজের লেখা জীবনীতে এগুলি অনুপস্থিত। তাঁর পুত্র শ্রী নারায়ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন –

> " 'আত্মজীবনচরিতের' অতি অল্প ভাগই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও স্বীয় শৈশবের সামান্য বিবরণ মাত্র, এই দুই পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ আছে। যদি তিনি, বিধবা বিবাহের আন্দোলনের সময় পর্য্যন্ত, অন্ততঃ তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও আমরা পর্য্যাপ্ত মনে করিতাম।"[২]

যদিও এই গ্রন্থটি ছাড়াও বিদ্যাসাগরের জীবন নিয়ে আরো বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিদ্যাসাগর চরিত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কর্মজীবন শুরু করার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন এবং এর পরবর্তী জীবনে তিনি অনেকেরই ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছিলেন। সুতরাং সে সময়ের ঘটনা পরম্পরা তিনি নিজে না লিখে গেলেও তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি অজানা থাকার কথা নয়। এই বিষয়ে শ্রী নারায়ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 471 - 480
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "যদি তিনি তাঁহার ছাত্রজীবনের ইতিহাস নিজে লিখিয়া যাইতে পারিতেন তাহা হইলেও তাঁহার জীবনচরিত সম্পূর্ণ করা সহজ হইত।"[৩]

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়শই তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নিজের জীবনের অনেক ঘটনার গল্প করতেন। এছাড়াও তিনি অনেক কাগজপত্র রেখে গেছেন। সেগুলিকে অবলম্বন করে তাঁর জীবনচরিত লেখা কিছু অসম্ভব ছিল না। কিন্তু জীবনচরিত নিজে লেখা আর অন্যের লেখার মধ্যে যে অনেকটা পার্থক্য তা আমরা সকলেই জানি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় তাঁর পিতা জীবনচরিত সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি বলে আক্ষেপ করে লিখেছেন–

> "কিন্তু তিনি নিজে লিখলে যেরূপ হইত, আর কিছুতেই সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।"[৪]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র চেয়েছিলেন তিনি যখন তাঁর পিতার জীবনচরিত ও চিঠিপত্র প্রকাশ করবেন তখন সেই গ্রন্থের শুরুতে বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনচরিতের এই দুইটি পরিচ্ছেদ সংযুক্ত করে দেবেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের আত্মজনেরা শুনেছিলেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মজীবনচরিত লিখেছেন। তাঁদের ইচ্ছা ও অনুরোধেই শ্রী নারায়ণচন্দ্র তাঁর পিতা যেটুকু লিখে রেখে গেছেন সেটুকুই অর্থাৎ মাত্র দু'টি পরিচ্ছেদ নিয়েই 'বিদ্যাসাগরচরিত' নামে এই অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশ করেছেন।

বিদ্যাসাগর চরিতের প্রথম পরিচ্ছেদের শুরু হয়েছে বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মগ্রহণের ঘটনা দিয়ে। একদিন দুপুরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বীরসিংহ গ্রাম থেকে আধ ক্রোশ দূরে কোমরগঞ্জ গ্রামের হাটে গিয়েছিলেন। পথে পিতা পুত্রের দেখা হলে পিতা বললেন,

> "একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।"[৫]

সেই সময়ে তাঁদের একটি গাই গর্ভিণী ছিল। ঠাকুরদাস ভাবলেন যে তাঁর পিতা গাইয়ের কথা বলছেন। কিন্তু বাড়ি পৌঁছে ঠাকুরদাস গোয়ালঘরের দিকে ছুটলে ঠাকুরদাসের পিতা হাসতে হাসতে বলেছিলেন,

> "ওদিকে নয়, এ দিকে এস; আমি তোমার এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।"[৬]

এই বলে তিনি ঠাকুরদাসকে তাঁর সদ্যজাত পুত্রকে দেখিয়ে দিলেন।

সদ্যোজাত ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর ঠাকুরদার এঁড়ে বাছুর বলার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। বিদ্যাসাগর নিজেই তাঁর আত্মচরিতের প্রথম পরিচ্ছেদে লিখেছেন –

> "এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে, অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে, তিনি, সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের পূর্ব্বোক্ত পরিহাস বাক্যের উল্লেখ করিয়া, বলিতেন, 'ইনি সেই এঁড়ে বাছুর'; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন, বটে; কিন্তু, তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন; তাঁহার পরিহাস বাক্যও বিফল হইবার নহে; বাবাজি আমার, ক্রমে এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।"[৭]

কিন্তু আমরা সবাই জানি ঠাকুরদার উল্লিখিত এই 'এঁড়ে বাছুর'টি ভবিষ্যৎ জীবনে একজন উল্লেখনীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন –

> "কিন্তু যুগ ঝঞ্ঝার তীব্র আক্রমণের মুখেও নিষ্কম্পদীপ শিখার ন্যায় আজও নিজ মহিমা প্রকাশ করে চলেছে, এমন একটি ব্যক্তিত্বের কথা আমরা কোনক্রমেই বিস্মৃত হতে পারি না। সে ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্য যুগান্তরেও ক্ষীণ হয়নি, বরং নতুন সমিধ পেয়ে তা আরও যেন বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে অপরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষটি হলেন 'বীরসিংহের সিংহশিশু' বিদ্যাসাগর। বরণীয় অনেক মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন, কিন্তু প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যে তিনি ছিলেন 'একতম'।"[৮]

বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের জন্ম হলেও এটি তাঁর পিতৃপক্ষের গ্রাম নয়। বীরসিংহ থেকে তিন ক্রোশ দূরে বনমালীপুর গ্রামে তাঁর পিতৃপক্ষের বহুকালের বাসস্থান। যে ঘটনাসূত্রে পূর্বপুরুষদের বাসস্থান ত্যাগ করে বীরসিংহ গ্রামে তাঁরা বসতি স্থাপন করেছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাও তাঁর আত্মপরিচয় গ্রন্থে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ সন্তান। নৃসিংহরাম, গঙ্গাধর, রামজয়, পঞ্চানন ও রামচরণ। এর মধ্যে তৃতীয় পুত্র রামজয় তর্কভূষণ হলেন ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ। বীরসিংহ গ্রামের প্রসিদ্ধ পন্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীকে বিয়ে করেন রামজয়। রামজয় ও দুর্গা দেবীর দুই ছেলে ও চার মেয়ে। ঠাকুরদাস, কালিদাস, মঙ্গলা, কমলা, গোবিন্দমণি ও অন্নপূর্ণা। এদের মধ্যে বড় পুত্র ঠাকুরদাসই হলেন ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা।

বড় দুই ভাইয়ের কর্তৃত্বে রামজয় বনমালীপুর ছেড়ে দেশত্যাগী হয়েছিলেন। দুর্গাদেবী তাঁর পুত্রকন্যাদের নিয়ে বনমালীপুরে রয়ে গেলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর ছেলে-মেয়েদের অযত্ন, অনাদর, অবহেলা ও তাদের উপর অত্যাচারের ফলে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে পিত্রালয়ে চলে এলেন। দুর্গাদেবীর পিত্রালয়ের লোক তাঁদের স্থান দিলেন। কিন্তু দুর্গাদেবীর পিতা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। দুর্গাদেবীর পিতা ও মাতার কোন কথাই সংসারে চলত না। সংসারের কর্তৃত্বের ভার অর্পিত হয়েছিল উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের ছেলে রামসুন্দর ও তার স্ত্রীর হাতে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে দুর্গাদেবীর পিতার ঘরে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। দুর্গাদেবী বুঝতে পারলেন যে তাঁর ভাই ও ভাইয়ের বউ অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁদের ভরণপোষণের ভার নিতে অনিচ্ছুক। তারা দুর্গাদেবী ও তাঁর ছেলেমেয়েদের তাদের গলগ্রহ বলে মনে করতে লাগলেন। কথায় কথায় রামসুন্দরের স্ত্রী দুর্গাদেবীকে অপমান করতেন। ভ্রাতৃবধূর অপমান যখন অসহ্য বোধ হতো, তখন দুর্গাদেবী তা নিজের পিতাকে জানাতেন। বৃদ্ধ পিতা উমাপতি এই সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারতেন না।

শেষপর্যন্ত দুর্গাদেবীকে তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে পিতার ঘর ত্যাগ করতে হয়। এই ঘটনায় উমাপতি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং নিজ বাড়ির কাছে তাঁর মেয়েকে ঘর করে দিলেন। সেই সময় অনেক নিঃসহায় নিরূপায় মহিলারা চরকায় সুতো কেটে নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন। দুর্গাদেবীও সেই পথ অবলম্বন করলেন। চরকায় সুতো কেটে দুর্গাদেবী অতি কষ্টে তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন –

> “তিনি একাকিনী হইলে, অবলম্বিত বৃত্তি দ্বারা, অবলীলাক্রমে, দিনপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাদৃশ স্বল্প আয় দ্বারা, নিজের, দুই পুত্রের, ও চারি কন্যার ভরণপোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা, সময়ে সময়ে, যথাসম্ভব, সাহায্য করিতেন; তথাপি তাঁহাদের, আহারাদি সর্ব্ববিষয়ে, ক্লেশের পরিসীমা ছিল না।”[৯]

দুর্গাদেবীর পিতা তাদের মাঝেমধ্যে সহায়তা করলেও এতজনের ভরণপোষণ সঠিকভাবে করা দুর্গাদেবীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই সময়ে ১৪-১৫ বছরের বড় পুত্র ঠাকুরদাস মায়ের অনুমতি নিয়ে কলিকাতা যাত্রা করল। তাঁদের এক আত্মীয় সভারাম বাচস্পতি কলকাতায় বাস করতেন। তাঁর পুত্র জগন্মোহন ন্যায়লঙ্কারের কাছে ঠাকুরদাস নিজের পরিচয় দেন এবং আশ্রয়প্রার্থনা করেন। জগন্মোহন ন্যায়লঙ্কার সৌজন্যের সঙ্গে আশ্রয় দেন ঠাকুরদাসকে।

ঠাকুরদাস বনমালীপুরে এবং বীরসিংহে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়েছিলেন। কলকাতায় ন্যায়লংকার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন করবেন ঠাকুরদাস প্রথমত এটাই স্থির হয়েছিল। ঠাকুরদাস নিজেও সংস্কৃতপাঠে ইচ্ছুক ছিলেন।

> “কিন্তু, যে উদ্দেশে, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কৃতপাঠে নিযুক্ত হইলে, তাহা সম্পন্ন হয় না।”[১০]

তিনি মূলত মা ও ছোট ছোট ভাইবোনদের কথা চিন্তা করেই ঘর ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন। তাই তাদের কথা মনে হলেই তাঁর মন থেকে সংস্কৃত পাঠের কথা অপসারিত হত। ফলে কলকাতায় তাঁর সংস্কৃত পাঠের ইচ্ছা থাকলেও তিনি উপার্জনে সক্ষম হয়ে ওঠার জন্য ন্যায়লঙ্কারের এক আত্মীয়ের কাছে ইংরেজী শিখতে শুরু করলেন। সে সময় মোটামুটি ইংরেজী জানা থাকলে কাজ পেতে সুবিধা হত। এই জন্য সংস্কৃতপাঠের বদলে ইংরেজী শেখাই তাঁর পক্ষে যথোপযুক্ত বলে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 471 - 480
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মনে হল। আর্থিক অসুবিধার জন্য ঠাকুরদাসের বিদ্যালয়ে গিয়ে ইংরেজী পড়া সম্ভব হল না, ন্যায়ালংকার মহাশয়ের পরিচিত একজন ব্যক্তির কাছে তাঁর ইংরেজী পড়া স্থির হল। কিন্তু দিনের বেলায় তাঁর সময় না থাকাতে সন্ধ্যার পর ঠাকুরদাস ইংরেজী পড়তে যেতেন। সন্ধ্যার পরে যে সময় তিনি ইংরেজি শিখতে যেতেন সেসময় বাড়িতে রাতের খাবারের সময় ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন –

> "ঠাকুরদাস, ইংরেজী পড়ার অনুরোধে, সে সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; যখন আসিতেন, তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না; সুতরাং, তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত।"[১১]

ঠাকুরদাসের এই দুঃখময় দিনের কথা ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম পরিচ্ছেদে লিখে গেছেন।

প্রতি রাতে অনাহারে থাকার ফলে ঠাকুরদাস শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর শিক্ষক একদিন এর কারণ জানতে চাইলে দুর্বলকায় ঠাকুরদাস তাঁর সমস্যার কথা জানালেন। ঐ সময়ে শিক্ষকের আত্মীয় শূদ্রজাতের একজন দয়ালু ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সব কথা শুনে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং বললেন –

> "যদি তুমি রাঁধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমায় আমার বাসায় রাখিতে পারি।"[১২]

এই কথা শুনে ঠাকুরদাস অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। কিন্তু এই সদাশয় দয়ালু ব্যক্তির দয়া ও সৌজন্য যতটা ছিল, আয় ততটা ছিল না। তিনি দালালি করে সামান্য উপার্জন করতেন। শুরুতে এই ব্যক্তির আশ্রয়ে এসে ঠাকুরদাসের দুইবেলা খাওয়া ও ইংরেজী পড়া ভালই চলতে লাগলো। কিন্তু কিছুদিন যাবার পরে ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার আয় একেবারেই কমে গেল। ফলে আশ্রয়দাতার ও আশ্রয়গ্রহিতার কষ্টের দিন উপস্থিত হল। সেই কষ্টের বর্ণনা রয়েছে এই গ্রন্থে –

> "তিনি, প্রতিদিন, প্রাতঃকালে, বহির্গত হইতেন, এবং কিছু হস্তগত হইলে, কোনও দিন দেড়প্রহরের, কোনও দিন দুই প্রহরের, কোনও দিন আড়াই প্রহরের সময়, বাসায় আসিতেন; যাহা আনিতেন, তাহা দ্বারা, কোনও দিন বা কষ্টে, কোনও দিন বা স্বচ্ছন্দে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দিন, তিনি দিবাভাগে বাসায় আসিতেন না। সেই সেই দিন, ঠাকুরদাসকে, সমস্ত দিন, উপবাসী থাকিতে হইত।"[১৩]

একদিন ক্ষুধার জ্বালায় তাঁর ভাত খাবার একটিমাত্র পিতলের থালা কাঁসারির দোকানে বেচতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে ঝামেলায় পড়ার ভয়ে অজানা অচেনা ঠাকুরদাসের কাছ থেকে কেউই থালাটি কিনতে রাজী হল না। আর একদিন দুপুরে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে ঠাকুরদাস এক দোকানের মুড়িমুড়কি বিক্রেতা মধ্যবয়স্কা এক বিধবা মহিলার কাছে জল চেয়েছিলেন। সেই রমণী ঠাকুরদাসের কাছ থেকে সব শুনে তৎক্ষণাৎ তাঁর খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যেদিন ঠাকুরদাসের খাবার না জুটবে সেদিন যেন সে তার দোকানে এসে খাবার খেয়ে যায়। বিদ্যাসাগর যে নারীদের দুঃখ দূর করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন তার একটা কারণ যে এই বিধবা রমণী তা তাঁর নিজের লেখাতেই স্পষ্ট –

> "পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল।"[১৪]

কলিকাতায় অবস্থানকালে ঠাকুরদাস কিভাবে আশ্রয়দাতার সহায়তায় মাসিক দুই টাকা বেতনের কাজ পেলেন, নিজে পূর্ব অবস্থায় থেকে সেই টাকা তিনি কিভাবে মায়ের নিকট পাঠাতে লাগলেন শুধু এই ভেবে যে এতে তাঁর মা ও ভাই-বোনেরা ভালো থাকবে, সেগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্রের লেখনীতে। এরপরে কিভাবে তাঁর বেতন বেড়ে পাঁচ টাকা হওয়ায় তাঁর মা ও ভাই-বোনেদের দুঃখ দূর হয়েছিল তার বর্ণনা 'বিদ্যাসাগর চরিত'এ রয়েছে।

এই সময় ঠাকুরদাসের পিতা দেশে ফিরে এলেন। বীরসিংহ গ্রামে কিছুদিন কাটানোর পর তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাসকে দেখার জন্য কলিকাতায় গেলেন। সেখানে তর্কভূষণ মহাশয়ের পরিচিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহ নামে এক সঙ্গতিসম্পন্ন দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় তাঁর আশ্রয়ে ঠাকুরদাসকে রেখে বীরসিংহে ফিরে এলেন।

ভাগবতচরণ সিংহ ঠাকুরদাসকে শুধু থাকার ও খাবার ব্যবস্থাই করলেন না, তাঁর সহায়তায় ঠাকুরদাস মাসিক আট টাকা বেতনে কাজও পেলেন।

'বিদ্যাসাগর চরিত'-এ প্রথম পরিচ্ছেদে প্রথমে পিতৃপক্ষের পূর্বপুরুষদের পরিচয় দেওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্র মাতৃপক্ষের পূর্বপুরুষদেরও পরিচয় দিয়েছেন। পাতুলনিবাসী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের চার পুত্র ও দুই কন্যা। রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, রামধন ন্যায়রত্ন, গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, গঙ্গা ও তারা। পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গাকে বিয়ে দিয়েছিলেন ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে পন্ডিত রামকান্ত তর্কবাগীশের সঙ্গে। রামকান্ত ও গঙ্গার দুই কন্যা লক্ষ্মী ও ভগবতী।

অল্পবয়সে পন্ডিত রামকান্ত তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলন করতে করতে উন্মাদগ্রস্ত হলেন। নিরুপায় গঙ্গা তাঁর পিতাকে এই সংবাদ পাঠালে পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ তাঁর কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রীদের নিজ বাড়িতে এনে স্থান দিলেন ও জামাতাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্ররাও তাঁদের বোন ও বোনের পরিবারকে হৃদ্যতার সঙ্গে লালন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর আত্মচরিতে পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের চার পুত্রের সুখময় একান্নবর্তী সংসারের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি লিখেছেন –

> "সৌজন্য ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে চারজনই সমান ছিলেন। এজন্য, কেহ, কখনও, ইঁহাদের চারি সহোদরের মধ্যে, মনান্তর বা কথান্তর দেখিতে পান নাই। স্বীয় পরিবারের কথা দূরে থাকুক, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, ভাগিনেয়ীদের পুত্রকন্যাদের উপরেও, তাঁহাদের অনুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ভাগিনেয়ীরা, পুত্রকন্যা লইয়া, মাতুলালয়ে গিয়া, যেরূপ সুখে সমাদরে, কালযাপন করিতেন, কন্যারা, পুত্রকন্যা লইয়া পিত্রালয়ে গিয়া, সচরাচর সেরূপ সুখ ও সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারেন না।"[১৫]

বিদ্যাসাগর মহাশয় তার মাতুলের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন –

> "ফলকথা এই, অন্নপ্রার্থনায়, রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া, কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই।"[১৬]

আমরা জানি করুণার সাগর বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনে প্রচুর মানুষকে সাহায্য করেছেন। আপামর মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছিলেন বলেই তিনি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর নামেও পরিচিত। পরবর্তী জীবনে বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে এই দয়া দাক্ষিণ্যের গুণগুলি দেখা গিয়েছিল তা তাঁর মাতুলের কাছ থেকেই পাওয়া। মামার বাড়ি থেকে ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁর পরিবার যেরূপ সহায়তা পেয়েছেন, তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন তিনি এই আত্মচরিতে –

> "রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট, আমরা, অশেষ প্রকারে, যে প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা পরিশোধ হইতে পারে না। আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে, মাতৃদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া, মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায়, ক্রমান্বয়ে, পাঁচ ছয় মাস বাস করিতেন; কিন্তু একদিনের জন্যেও, স্নেহ, যত্ন, ও সমাদরের ত্রুটি হইত না।"[১৭]

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঁচ বছর বয়সের সমকাল থেকে 'বিদ্যাসাগরচরিত' এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরু। পাঁচ বছর বয়সে বীরসিংহ গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্র ভর্তি হলেন। পাঠশালায় এক বছর শিক্ষালাভের পর তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ছয় মাস পার হয়ে যাবার পরও তিনি সুস্থ হলেন না। রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ঈশ্বরের অসুস্থতার খবর পেয়ে বীরসিংহ গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিন মাস ভালো চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করানোর পর ঈশ্বরচন্দ্র সুস্থ হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন –

> "এই সময়ে, আমার উপর, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ও তদীয় পরিবারবর্গের স্নেহ ও যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল।"[১৮]

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পিতা ও ঠাকুমার কাছে বিভিন্ন সময়ে তাঁর ঠাকুরদার নানা গল্প শুনেছিলেন। সেই শোনা কথাগুলি তিনি তাঁর আত্মচরিতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। এই অংশটি থেকে বিদ্যাসাগরের পিতামহের একটি সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। পিতামহ সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন –

> "তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সংকুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন।"[১৯]

বস্তুত তর্কভূষণ মহাশয় ছিলেন অকুতোভয় এবং স্পষ্ট বক্তা এক অগ্নিময় পুরুষ। যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেও দেখতে পাই। এই সম্পর্কে কবি লিখেছেন –

> "সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
> তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।"[২০]

পিতামহের মৃত্যুর পর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। কলকাতায় এসে তিনি বড়বাজারনিবাসী ভাগবতচরণ সিংহের একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহের সংসারে আশ্রয় পেয়েছিলেন। এই পরিবারের ছত্রছায়ায় ঈশ্বরচন্দ্র যে দিনগুলি অতিবাহিত করেছেন তার বর্ণনা বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে। তিনি লিখেছেন –

> "এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটীতে আছি বলিয়া, একদিনের জন্যেও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু, কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন, আমি, কস্মিন্ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না।"[২১]

জগদ্দুর্লভবাবুর বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির কাছে ঈশ্বরচন্দ্র অত্যাধিক স্নেহ ও যত্ন পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন –

> "আমি স্ত্রী জাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদগুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমন্ডলে নাই।"[২২]

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বহু কথিত মাইলস্টোনের যে উপাখ্যানটি রয়েছে এর বর্ণনাও এই পরিচ্ছেদেই আছে। এই মাইলস্টোনের গল্প শুনেই বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরদাসকে বলেছিলেন –

> "দাদামহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে মানুষ হইতে পারিবেক।"[২৩]

মাইলস্টোনের গল্প শুনে ঠাকুরদাসের আত্মীয়রা বিদ্যাসাগরকে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করানোর কথা বললেও ঠাকুরদাস রাজী হননি। এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছেন –

> "আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতব্যবসায়ী; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্য বশতঃ ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই; ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমতো সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব। এজন্য পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ তাঁহার মনোনীত হইল না।"[২৪]

আসলে ঠাকুরদাস চেয়েছিলেন যে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত শিখে চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করবে। তাই তিনি বলেছিলেন–

> "উপার্জনক্ষম হইয়া, আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক।"[২৫]

তাই ঠাকুরদাস শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মধুসূদন বাচস্পতির পরামর্শে ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করালেন। এই পর্যন্ত এসে আত্মজীবনী রচনায় বিদ্যাসাগরের লেখনী অবসর নিয়েছে।

কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন তো এখানেই থেমে থাকেনি। সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করার পর তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছে। তাঁর জীবনে তিনি নারীদের শিক্ষার জন্য লড়াই করেছেন। বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য সংগ্রাম করেছেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি অনেকগুলি অনুবাদমূলক ও মৌলিক গ্রন্থের রচয়িতা। অথচ এতসব কথা তাঁর লেখনীতে স্থান পেল না। তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র মনে করেন তাঁর পিতা যদি নিজের ছাত্রজীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখে যেতে পারতেন, তবে তাঁর জীবনচরিত সম্পূর্ণ করা সহজ হত।

আমরাও মনে করি যে পরবর্তী সময়ে বিদ্যাসাগরের জীবনী গ্রন্থ যতই রচিত বা প্রকাশিত হোক না কেন, তাঁর নিজের লেখনীতে নিজের জীবনী গ্রন্থ রচনার একটা স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে। কারণ অন্যের রচিত গ্রন্থ জীবনী গ্রন্থই হবে, আত্মজীবনী নয়। আর জীবনীগ্রন্থ ও আত্মজীবনী গ্রন্থের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য তো রয়েছেই। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর জীবনে আমাদের বাংলা সাহিত্যকে, আমাদের সমাজকে অনেক কিছুই দিয়ে গেছেন। তাঁর এই ঋণ পরিশোধ করার মতো নয়। তাই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিদ্যাসাগর চরিত' রচনায় বলেছেন–

> "আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি; এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, ততই আমরা পুরুষের মতো দুর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"[২৬]

কিন্তু যে আত্মজীবনী রচনায় তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন, সেই কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি বলে আমাদের চিরদিনের জন্যই আক্ষেপ রয়ে গেল।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ, (সংকলিত), 'বিদ্যাসাগরচরিত', ভূমিকা
২. তদেব
৩. তদেব
৪. তদেব
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ, (সংকলিত), 'বিদ্যাসাগরচরিত', প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১
৬. তদেব, পৃ. ২
৭. তদেব, পৃ. ২-৩
৮. মুরশিদ, গোলাম, 'বিদ্যাসাগর', দ্রষ্টব্য: 'বিদ্যাসাগর : সংস্কারক এবং শিল্পী', সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩৪
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ, (সংকলিত), 'বিদ্যাসাগরচরিত', প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ. ০৭-০৮
১০. তদেব, পৃ. ০৯
১১. তদেব, পৃ. ১১
১২. তদেব, পৃ. ১২

১৩. তদেব, পৃ. ১২-১৩
১৪. তদেব, পৃ. ১৬
১৫. তদেব, পৃ. ২৬
১৬. তদেব, পৃ. ২৬
১৭. তদেব, পৃ. ২৭-২৮
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ, (সংকলিত), 'বিদ্যাসাগরচরিত', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩০
১৯. তদেব, পৃঃ ৩৪।
২০. দে, বিশ্বনাথ, (সম্পাদিত), 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি', দ্রষ্টব্য : 'সাগর-তর্পণ', সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ৪
২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ, (সংকলিত), 'বিদ্যাসাগরচরিত', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৯
২২. তদেব, পৃ. ৪০
২৩. তদেব, পৃ. ৫০
২৪. তদেব, পৃ. ৫১
২৫. তদেব, পৃ. ৫১-৫২
২৬. বসু, বিমান, সম্পাদনা- 'প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর', দ্রষ্টব্য : ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিদ্যাসাগর চরিত', পৃ. ৮২-৮৩

Bibliography:

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, (সংকলিত), 'বিদ্যাসাগর চরিত' ক্যালকাটা লাইব্রেরী, ১৯৪৮
বসু, বিমান, সম্পাদনা-'প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর', বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার কমিটি, কলি-১৪, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১
চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব, 'নবজাগরণের নায়কেরা', পত্রভারতী, ১ম প্রকাশ, ২০১৪
বসু, শ্যামাপ্রসাদ, 'বিদ্যাসাগর এক আধুনিক মানুষ', এন ই পাবলিশার্স, কলি-৪৫, ২য় প্রকাশ, ২০০৬
ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, 'বিদ্যাসাগর নানা প্রসঙ্গ', চিরায়ত প্রকাশন প্রা লি, কলি-৭৩, ১ম সংস্করণ, ২০১১
ভৌমিক, দ্বিজেন্দ্র, 'জন্মদ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর' (সম্পাদনা), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১ম সংস্করণ, ২০২০
মুরশিদ, গোলাম (সম্পাদক), ''বিদ্যাসাগর' (সার্ধশত-বর্ষ স্মারকগ্রন্থ), শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৭০
দে, বিশ্বনাথ, (সম্পাদিত), 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি', ১ম প্রকাশ, ১৩৬৭, সাহিত্যম্, কলিকাতা-৭৩